শ্রমিকদের জীবন ও লড়াই-এর কাহিনী

বাংলাদেশে শ্রমিকদের জীবন ও কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি, তাঁদের প্রতিদিনের লড়াই, বিভিন্ন ধরনের পেশার বাস্তব চিত্র নিয়ে গবেষণা খুবই কম। এবিষয়ে বিস্তৃত তথ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান, মালিকদের প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এমনকি শ্রমিক সংগঠন কোথাও পাওয়া কঠিন। এখানে বিভিন্ন পেশার কয়েকজন শ্রমিকের জীবনের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। এই শিরোনামে আমরা নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করতে আগ্রহী। - সম্পাদনা পরিষদ

নির্মাণ শ্রমিক মনির হোসেন

মনির হোসেন, বয়স ২৩ বছর। মূলত রড নিয়েই তাঁর কাজ। ভবন নির্মাণের বেলায় কলাম ও বিম তৈরি এবং ছাদ ঢালাইয়ের সময় রড কাটা, বাঁধা, ওঠানো-নামানো, কলাম ও বিমে বসানো ইত্যাদি কাজ করতে হয় তাঁকে। দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ। সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ চলে। এ কাজে সাপ্তাহিক ছুটি বলে কিছু নেই। কোনো দিন কাজে না গেলে ঐ দিনের মজুরি পান না। তাঁর বর্তমান দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা। সাত বছর আগে ভোলা থেকে ঢাকায় এসে যখন ওস্তাদের হেল্পার হিসেবে কাজ শুরু করেন তখন মজুরি ছিল ৩০০ টাকা। ৫০০ টাকা তাঁর হাতে একবারে দেওয়া হয় না; কন্ট্রাক্টর প্রতিদিন কাজ শেষে ৪০০ টাকা দেয়, বাকি ১০০ টাকা একেবারে ভবনের পুরো কাজ শেষে দেবে বলে আটকে রাখে। কাজ শেষে কখনও সেটা পাওয়া যায়, কখনও পাওয়া যায় না।

পাঁচতলা একটি ভবন নির্মাণের কাজ শেষ হতে যদি পাঁচ মাস লাগে তাহলে দৈনিক ১০০ টাকা হিসাবে পাঁচ মাস শেষে কন্ট্রাক্টরের কাছে বকেয়া পাওনা হয় ১৫ হাজার টাকা। দেখা যায়, কন্ট্রাক্টর অনেক সময় দিনের পর দিন ঘোরায়, অনেক ঘুরেটুরে হয়তো পাঁচ-সাত হাজার টাকা পাওয়া যায়। আর দৈনিক পাওয়া ৪০০ টাকা থেকে কম করে হলেও ১০০ টাকা খরচ হয়ে যায় নাশতা ও দুপুরের খাবার খেতে। এমনকি ঘর্মাক্ত শরীরের লবণশূন্যতা পূরণের জন্য স্যালাইনের প্যাকেটও তাঁদেরই কিনতে হয় বলে জানালেন মনির। ডজনখানেকের মতো বহুতল ভবনে যাঁর ঘাম মিশে আছে, স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তিনি মিরপুর দুয়ারীপাড়ায় এক কক্ষবিশিষ্ট একটি কাঁচা ঘরে থাকেন, ভাড়া ১৫০০ টাকা। কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে কাজ পান, একটা চার-পাঁচতলা ভবনের কাজ পেলে কয়েক মাস চলে যায়, কিন্তু কাজ না পেলে বসে থাকতে হয়।

কাজের অনিশ্চয়তা, রোদ-বৃষ্টিতে ভিজে খোলা আকাশের নিচে কাজের কষ্ট, কন্ট্রাক্টর-ইঞ্জিনিয়ারদের দুর্ব্যবহার, কন্ট্রাক্টরের প্রতারণা ইত্যাদি সমস্যা তো আছেই, তবে এই কাজের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ঝুঁকি। প্রতিদিন মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজের জন্য বিশেষ কোনো পোশাক, গ্লাভস, হেলমেট, বুট, উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। কারো হাত থেঁতলে যায়, পায়ে তারকাঁটা বেঁধে, রডের রিং বাঁধতে গিয়ে রড ছিটকে গায়ে লাগে, রাস্তার বৈদ্যুতিক তারের শক খেয়ে মৃত্যু ঘটে, উঁচু বিম বা নির্মাণাধীন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়, পঙ্গুত্ব বরণ করে ধুঁকতে হয়। তাঁর হাত-পায়েও এ রকম বেশ কিছু আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল। গত সাত বছরে মনির হোসেন তাঁর কর্মক্ষেত্রের নির্মাণাধীন ভবন থেকে ৩০-৩৫ জনকে পড়ে যেতে দেখেছেন, যাদের মধ্যে সাতজনের তাৎক্ষণিক মৃত্যু ঘটেছে, আহতদের মধ্যে কয়েক জন পঙ্গুত্ব বরণ করে এখনও ধুঁকছে। দুর্ঘটনা ঘটলে কন্ট্রাক্টর কখনও চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেয়, কখনও নেয় না; পুরো ব্যাপারটাই কন্ট্রাক্টরের দয়ার ওপর নির্ভর করে। তিনি নিহত-আহতদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে দেখেছেন।

এই ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আর বেশিদিন না করার ইচ্ছার কথা জানিয়েছেন মনির। তাঁর ইচ্ছা, কিছু টাকা-পয়সা জমলে একটি মুদি দোকান ভাড়া নিয়ে বসবেন। তাঁর সাথে কাজ করেছে এ রকম অনেকেই মুদি দোকান, হার্ডওয়্যার, পাইপ, স্যানিটারি ইত্যাদি ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছে আবার কেউ নির্মাণ শ্রমিকের কাজ ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেছে বলে জানালেন।

-কল্লোল মোস্তফা

জেলে থেকে রিকশাচালক

জ্যামের ভেতর সামান্য ফাঁকফোকর দিয়ে তাঁর প্রায় উড়ে চলা রিকশায় চড়লে বিশ্বাসই হতে চায় না যে এই পেশায় কাশেম একেবারেই নতুন। কাশেমের বয়স আনুমানিক ৩৫। ভোলার চরফ্যাশন থেকে গত বছরের জুলাই মাসে প্রথমবারের মতো ঢাকায় আসেন। হাজারীবাগ থেকে লালমাটিয়া যাওয়া-আসার পথে আমার পরিচয় হয় কাশেমের সাথে। কথায় কথায় জানতে পারি তাঁর ঢাকায় আসার বৃত্তান্ত। আগে পেশায় ছিলেন জেলে। ছোটবেলা থেকেই মেঘনার বুকে ভেসে ইলিশ মাছ ধরাতে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঢাকায় কেন এলেন? ওইখানেই তো মনে হয় ভালো ছিলেন? জিজ্ঞেস করায় কাশেম মৃদু হাসেন। বলেন, 'মামা, ঐ জায়গায় খাইয়া-পইরা ভালোই আছিলাম। মৌসুমে কামাই হইত ৬০-৭০ হাজার ট্যাকা। কিন্তু বছরে কাম থাকত মাত্র ছয় মাস। বাকি ছয় মাসে জমাইন্যা ট্যাকা বেশিদিন রাখতে পারতাম না।' কোনো রকম অক্ষরজ্ঞান না জানা কাশেম তাই চলে আসেন সকল মৌসুমে ব্যস্ততার এই শহর ঢাকায়।

নয় মাস আগে গ্রামের এক পরিচিত বড় ভাইয়ের সাথে তিনি কামরাঙ্গীরচরে চলে আসেন। তখন যে মহাজনের রিকশা ভাড়ায় চালাতেন, সেই মহাজনের গ্যারেজেই থাকতেন। দিনে ১০০ টাকা চুক্তিতে তিন বেলা খেতেন। এর প্রায় পাঁচ মাস পর মাসিক দুই হাজার টাকার চুক্তিতে একটি ঘর ভাড়া নেন। এ বছরের জানুয়ারিতে তিনি নিয়ে আসেন তাঁর স্ত্রী আর দুই ছেলেকে। পাশাপাশি লাগোয়া ১৩টি টিনের ঘরের একটিতে তাঁরা থাকেন। ১৩ পরিবারের রান্নার জন্য সেখানে চুলা মাত্র চারটি আর পায়খানা দুটি। কাশেমের স্ত্রী আরজু। ভোর ৫টায় উঠেই তাঁর চুলায় ভাত বসাতে হয়। আগের দিনের বাসি তরকারি গরম করে স্বামী-সন্তানের জন্য সকালের খাবার রেডি করে ৭টা বাজতেই আরজু বেরিয়ে পড়েন কাজের উদ্দেশ্যে। চার বাসায় গৃহকর্মীর কাজ করে মাস শেষে পাঁচ হাজার টাকা পান। কাশেম ৭টা-সাড়ে ৭টার দিকে ঘুম থেকে উঠে বউয়ের রেখে যাওয়া গরম ভাত খেয়ে রিকশা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কাশেমের ছোট ছেলের নাম জুনাইদ। বয়স এক বছর দুই মাস। তাকে দেখাশোনা করে কে? জিজ্ঞেস করলে কাশেম জানান যে জুনাইদ সারা

দিন আশপাশের ঘরগুলোতে ঘুরেফিরে বেড়ায়। 'হেতেরাই দেইখ্যা রাহে,' জবাব দেন তিনি।

–আর আপনার বড় ছেলে? তার নাম কী?

–বড় পোলার নাম নাঈম। বয়স মনে করেন যে ১০ হইব। এতদিন আমার কাছেই আছিল। কয়দিন হয় নানায় লইয়া গ্যাছে।

কেন! নানা নিয়ে গেল কেন? বলে বিস্ময় প্রকাশ করতেই কাশেম বলেন, 'আমার কাছে রাইখ্যা কী করমু। নানার কাছে থাকলেই কিছু পড়ালেখা শিখতে পারব।' জানলাম নাঈমের নানা অর্থাৎ কাশেমের শ্বশুর ক্ষেতে গরু চড়ান আর একটা জিলাপি দোকানে সাহায্যকারীর কাজ করেন। নাঈমকে তার নানা এরই মধ্যে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়ে দিয়েছেন।

–ছেলের জন্য খারাপ লাগে না?

–লাগেই তো। পোলাডাও যাওনের সময় অনেক কানছে। কিন্তু কী করমু? মানুষ তো করন লাগব। আমার কাছে রাখলে তো আর পড়াইতে পারুম না।

কাশেম দিনে প্রায় ১০ ঘণ্টা রিকশা চালান। প্রতিদিন ৬০০-৭০০ টাকা রোজগার। রাস্তার খরচ বাদ দিয়ে রিকশা গ্যারেজে জমা দিয়ে হাতে প্রায় ৪০০-৫০০ টাকা থাকে।

–ডেইলি গাড়ি চালান?

–হ মামা, ডেইলি চালাই। সকাল ৮টায় বাইর হইয়া ২টায় ফিরা আহি। দুপুরে খাইয়া এট্টু জিরাইয়া ৪টা বাজে বাজার কইরা দিয়া আবার গাড়ি লইয়া বাইরাই। রাইতে বাসায় ফিরি ৮টা-সাড়ে ৮টার দিকে।

বেশির ভাগ কী বাজার করেন? জানতে চাইলে তিনি জানান যে প্রায় সময়ই তেলাপিয়া, পাঙ্গাশ আর তা না হলে ডিম কেনেন। অন্য মাছ কিংবা মাংস কেনেন না? জানতে চাইলে বলেন, 'বাজারে যেই ট্যাকা খরচ করি, ওই দামে অন্য মাছ, মাংস পামু কই? আমার চাষের মাছই সই।' প্রতিদিন ১০-১১ ঘণ্টা রিকশা টানতে কষ্ট হয় কি না জানতে চাইলে কাশেম বলেন, 'হেইডা তো হয়ই। তয় কি মামা, কামের শরীর ভালা থাকে।' সামনে আপনার প্ল্যান কী? কয় বছর পর কিছু টাকা জমলে কি ব্যবসা করবেন? চিন্তা করছেন কিছু? জিজ্ঞেস করলে উত্তর আসে, 'না, মামা। আমি আর কী করমু! লেহাপড়া জানি না। ধরেন যে একটা মুদি দোকান দিলেও তো হিসাব করন লাগে। আমি তো কিছুই পারি না। আমার এই রিকশাই চালান লাগব।' কাশেমের ঘরে টিভি নেই। রাতে বাসায় ফিরে স্ত্রী-সন্তানের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ কখনও হয়ে ওঠে না। ক্লান্ত শরীরে ক্ষুধার্ত পেটে বউয়ের রান্না করা ভাত চালান করে দিয়ে ৯টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে কাশেম কি কোনো স্বপ্ন দেখেন? বড় ছেলে নাঈমকে নিজের কাছে নিয়ে আসার স্বপ্ন? কিংবা বৃদ্ধ মা-বাবাকে শেষ বয়সে একটু সঙ্গ দেওয়ার স্বপ্ন? অথবা আগের সেই জীবনে ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন?

মেঘনার বুকে সুনিপুণ দক্ষতায় কিছুদিন আগেও জাল বিছিয়ে দিত যে হাত, নয় মাস ধরে সেই হাতই পরিচিত হয়ে উঠছে রিকশার হ্যান্ডেল ধরাতে। বাপ-দাদার পেশা ছেড়ে যে সমাজব্যবস্থায় কাশেমের পরিচয় আজ জেলে থেকে রিকশাওয়ালা, সেই একই সমাজে কাশেমের পরবর্তী প্রজন্মের পরিচয় তাহলে কী?

-মওদুদুর রহমান

লিটনের গ্যারান্টিবিহীন জীবন

লিটন একজন ট্যানারি শ্রমিক। কিছুদিন আগ পর্যন্ত তিনি কাজ করতেন ট্যানারির ভেতরে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে আর এখন কাজ করেন চামড়া প্রক্রিয়াকরণের বিভিন্ন পর্যায়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার শ্রমিক হিসেবে।

–ট্যানারির ভেতরের কাজ ছাড়লেন কেন?

–ভিতরে কাম কইরা পোষায় না, ভাই। ৮টা- ৫টা ডিউটি। কিন্তু ওভারটাইমের বেলায় আবার জোর কইরা কাম করায়।

–কত পাইতেন?

–আমি নতুন আছিলাম তো, সব মিলাইয়া পাঁচ হাজারের মতো পাইতাম।

–আর পুরান হইলে কত পাইতেন?

–পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা হইলে আপনে ট্যানারিতে পার্মানেন্ট হইতে পারবেন। হের পর আপনের বেতন বাড়ব। তহন কিছু সুযোগ-সুবিধাও পাইবেন। যেমন ধরেন– বাড়িভাড়া, চিকিৎসা।

–তাহলে তো ভালোই।

–ক্যামনে! এইহানেও প্যাঁচ আছে। আপনে যদি কোনো ট্যানারিতে কাম করতে থাহেন আর পাঁচ বছর হওনের দুই মাস আগেও ঐ ট্যানারি থিকা যদি আপনেরে বাইর কইরা দেয় তয় ফিরা আবার নতুন কইরা আপনের সময় গুনতি শুরু হইব। তয় ১০-১২-১৫ বছর হইলে এইহানে ভালা সুবিধা আছে। চাকরি শেষে ভালা ট্যাহাও দেয় কিছু।

–ও! তার মানে প্রথম দিকে কষ্ট আছে?

–হ, তয় কেমিকেলের কামে রেট বেশি। কিন্তু আমি ওই কাম করতাম না। আমি করতাম শুকনা বকরির চামড়ার কাম।

লিটনের কাছে জানা গেল যে হাতে, পায়ে ও চোখে জ্বালা করা, চুলকানি, ক্ষয়রোগ ইত্যাদি সমস্যার কারণে অনেকেই রাসায়নিক ব্যবহার করে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ের চেয়ে শুকনো চামড়া কাটা, গ্রেড সিলেকশন করা, পরিবহন ইত্যাদি কাজ করতে বেশি আগ্রহী থাকেন। তবে রাসায়নিক ব্যবহার করে চামড়া প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়েই নাকি পরিশ্রম তুলনামূলকভাবে কম, কিন্তু ঝুঁকি বেশি। যেমন: কোনো ট্যানারিতে ব্যবহারের পর ফেলে দেওয়া রাসায়নিকমিশ্রিত পানি আবার বিশেষ কিছু কারখানায় ব্যবহৃত হয়। সেই কেমিক্যালের পানি কাঁধে ঝোলানো বিশেষ জারে করে আশপাশের নির্দিষ্ট কারখানায় পৌঁছে দিলে ২ টাকা করে পাওয়া যায়। হাজারীবাগে ট্যানারি এলাকার যে কোনো রাস্তা ধরে হাঁটলে কিছু সময় পর পরই চোখে পড়ে হাত-পায়ে কোনো রকমের দস্তানা বা জুতা না পরে ড্রেন থেকে এই বিষাক্ত রাসায়নিকমিশ্রিত কালো পানি সংগ্রহের দৃশ্য। তারা বেশ নির্বিকার চিত্তে সারাক্ষণ হাত-পা ভেজা শরীরে এই রাসায়নিক সংগ্রহ করে পৌঁছে দিচ্ছে নির্ধারিত জায়গায়।

–আপনি তো এখন ঠেলাগাড়ি চালান। প্রতিদিন কত দূরত্ব যাওয়া-আসা করেন?

–কত দূর যাওন লাগে এর কুনো হিসাব নাই। এইডা পাশাপাশি দুইডা বিল্ডিংয়েও হইতে পারে আবার এক মাথা থেইকা আরেক মাথা তরিও হইতে পারে।

–রেট কত?

–রেট হগল সময় সমান। ভিজা চামড়া পিসে দুই ট্যাহা আর শুকনাডাতে এক ট্যাহা কইরা।

–এক ঠেলা কয়জন ঠেলেন?

–ধরেন যে চাইরজন। সবার সমান এক ভাগ কইরা আর সর্দার চালাইলে তিন ভাগ, না চালাইলে দুই ভাগ।

লিটন জানান, কে কত বেশি কাজ পাবে, ট্যানারির সাথে তাদের সর্দারের সম্পর্ক কত বেশি ভালো এটা তার ওপর নির্ভর করে। যত বেশি ট্যানারির সাথে তাদের মালিক বা সর্দারের সম্পর্ক থাকবে, চামড়া এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার অর্ডার পাওয়ার সম্ভাবনা তত বেড়ে যাবে। আমি যেদিন লিটনের সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম, সেদিন তিনি আর তাঁর অপর তিন সহকারী কোনো কাজের অর্ডার পাননি। সেদিন

লিটনের উপার্জন ছিল শূন্য আর তার আগের দিন ইনকাম হয়েছিল ৪৫০ টাকা।

–আগে কী করতেন?

–আগে কর্ণফুলী নদী থিকা বালু তুলতাম। প্রতি নৌকা বালুভর্তি কইরা চাইরজন মিইল্যা কামাই হইত ৪০০ ট্যাহা। ডেইলি তিন-চাইর নৌকার কাম করতে পারতাম।

–ওই কাজ বাদ দিয়ে ঢাকায় এলেন কেন?

–বিয়া কইরা ফ্যামিলি নিয়া ঢাকায় আইছি। এত খাটনির পর ওই ট্যাহা দিয়া সংসার চালানি কষ্ট হইত। ঢাকায় আমার ভায়রা-ভাইও থাহে। হেই আমারে আনছে।

এখন তাঁর আয় কত জানতে চাইলে লিটন বলেন, প্রতি মাসে তিনি ১৫-১৬ হাজার টাকা পর্যন্ত আয় করতে পারেন। স্ত্রী আর দুই সন্তানের সংসারের সব খরচ, ঘরভাড়া–এসব কিছু তাঁর একার উপার্জনে চালাতে হয়। সব খরচ করে তাঁর হাতে মাস শেষে দু-তিন হাজার টাকা থাকে। তিনি আগে 'যুবক' সমিতিতে প্রতি মাসে কিছু টাকা জমা রাখতেন। কিন্তু সেখানে তাঁর মতো আরো অনেকের জমানো সব টাকা নিয়ে এক বছর পর ঐ সমিতির সবাই হঠাৎ করেই উধাও হয়ে যায়। এখন তিনি ইসলামী ব্যাংকে পাঁচ বছর মেয়াদি একটা ডিপিএস হিসাব খুলেছেন। সেখানে প্রতি মাসে দুই হাজার টাকা জমা করেন। আর বাকি টাকা দেশের বাড়িতে গেলে, চিকিৎসা বা অন্য কোনো বিশেষ কাজে কোনো না কোনোভাবে খরচ হয়ে যায়।

লিটনের ভিটেমাটি, জায়গাজমি–সব ছিল। পাঁচ বছর আগে তাঁর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া খেজুর আর সুপারি বাগান কিনে নিতে এক আগ্রহী ক্রেতা ১১ লাখ টাকা পর্যন্ত প্রস্তাব করেন। লিটন আর তাঁর তিন ভাই তখন তা বিক্রি না করে ভবিষ্যতে সেই জমি কাজে লাগিয়ে আরো উন্নতির কথা চিন্তা করতে থাকেন। কিন্তু এর পরপরই অবস্থা পাল্টে যেতে শুরু করে। শুরু হয় নদীভাঙন। সেই সুপারি আর খেজুর বাগান এরই মধ্যে নদীভাঙনে বিলীন হয়ে গেছে আর লিটনের পরিবার হয়ে পড়েছে নিঃস্ব। এখন তাঁদের চার ভাইয়ের মধ্যে দুই ভাই চট্টগ্রামে রাজমিস্ত্রির কাজ করে, এক ভাই নৌকায় বালু তোলার কাজ করে আর লিটন কাজ করেন ট্যানারিতে।

–বছরে কাজের চাপ কখন বেশি থাকে? নাকি সব সময় একই রকম?

–আমাগো রমজান মাস আর কুরবানির পর ছয় মাস রেগুলার কাম থাহে। কুরবানি ঈদের তিন দিন তো মনে করেন যে কাঁচা চামড়ার কাম থাহে। ওই সময়ে পাঁচ-ছয় হাজার ট্যাহা কামাই হয়। ওইডা ধরেন আমাগো একটা বোনাস।

–টাকা-পয়সা জমাইয়া সামনে অন্য কিছু করবেন নাকি?

–হ, এই জীবনের তো কোনো গ্যারান্টি নাই। গরমের সময় জানে পানি থাহে না। এই কাম আর বেশিদিন করমু না।

–কী করবেন?

–দেহি, দুই-এক বছরের মইদ্যে ট্যাহা ভাও কইরা একটা চায়ের দোকান দিমু। চায়ের দোকানে ম্যালা লাভ।

–কী রকম লাভ?

–ধরেন যে দিনে চাইর-পাঁচ হাজার ট্যাহার বিক্রিতে পাঁচ-ছয় শ লাভ তো থাহেই।

–আপনি ক্যামনে জানলেন?

–দেহি না! সব দোকানেই তো লাইন ধইরা থাহে।

–কিন্তু ভালো পজিশনে জায়গা আপনি ক্যামনে জোগাড় করবেন? তাছাড়া বাকির রিস্ক আছে, এলাকার চাঁদাবাজি আছে, উচ্ছেদের ভয় আছে। চায়ের দোকানের ব্যবসারও তো কোনো গ্যারান্টি নাই।

একথার উত্তরে লিটন আর কোনো কথা বলেন না। জীবনের গ্যারান্টি খুঁজে পেতে তিনি ভোলা থেকে চট্টগ্রাম গেছেন, চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসেছেন, ঢাকায় পেশা পরিবর্তনও করেছেন। কিন্তু কোনো জীবনই গ্যারান্টি দিয়ে আপন করে না এই লিটনদের। লিটনদের কাছে জীবনের গ্যারান্টি সব সময়ই 'নদীর ঐ পাড়েতে সর্বসুখের' মতন একটা ব্যাপার, যা শুধু তাঁরা একে অপরের জীবনেই দেখতে পান, কিন্তু নিজের জীবনে কখনও নয়।

-মওদুদুর রহমান

পরিচ্ছন্নতাকর্মী শফিকুল

শফিকুল ইসলাম। বয়স ১৩-১৪ বছর হবে, যদিও তার দাবি ১৭। কাজ করছে 'ক্লিনকো' নামের একটি বেসরকারি কোম্পানির পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে। অবশ্য তার কর্মক্ষেত্র একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে। কর্পোরেট কোম্পানিগুলো সিকিউরিটি, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি যেসব কাজ কম খরচে সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব কর্মী না রেখে তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সম্পন্ন করে, শফিক সেই আউটসোর্সিং মডেলের একজন শ্রমিক।

এটি শফিকুলের তৃতীয় পেশা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে ঢাকা আসার আগে কিছুদিন সিএনজি চালিয়েছে, ঢাকায় এসে কিছুদিন গুলশান ডিসিসি মার্কেটের একটি গিফট শপে দামি কলম ও খেলনা মেরামতের কাজ করেছে। বেতন ছিল চার হাজার টাকা। বাবা-মা, তিন ভাই ও এক বোন নিয়ে সে থাকে কড়াইল বস্তিতে। বাবা সেলুনে চুল কাটার কাজ করেন, তার বড় ভাইটিও ক্লিনকোতে কাজ করেন। ছোট দুই ভাই স্কুলে গেলেও তার স্কুলে পড়া হয়নি।

বর্তমান বাজারে কর্পোরেট কোম্পানির নিচের স্তরের নিজস্ব একজন কর্মীর বেতন ১২ থেকে ১৫ হাজার টাকা হলেও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগকৃত শফিকুলের বেতন মাত্র সাড়ে চার হাজার টাকা। পরিচ্ছন্নতাকর্মী বা ক্লিনার, টি বয়, সিকিউরিটি গার্ড– সবার বেতন কাঠামো এ রকমই। বহুজাতিকের নিজস্ব কর্মী হলে যেসব ন্যূনতম অধিকার (চিকিৎসা বিমা, নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক ছুটি, ইনক্রিমেন্ট, প্রভিডেন্ট ফান্ড ইত্যাদি) তার প্রাপ্য হতো; এসব কোনো কিছুই তার প্রাপ্য নয়। কোম্পানির নিজস্ব কর্মীদের সপ্তাহে দুই দিন ছুটি প্রাপ্য হলেও শফিকুলের মতো আউটসোর্সড শ্রমিকদের সাপ্তাহিক ছুটি এক দিন। প্রতিদিন সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত ডিউটি। অফিসের একটি ফ্লোরের মেঝে, টেবিল, সিঁড়ি, দরজা, বাথরুমের আয়না, মেঝে, কমোড, সিংক, ইউরিনাল ইত্যাদি পরিষ্কার করা তার কাজ। একজন সুপারভাইজার দিনে তিনবার এসে চেক করেন এগুলো ঠিকঠাক পরিষ্কার থাকছে কি না। কর্মস্থলে তার বসার কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই, বাথরুমে 'স্যার'দের অজু করার স্থানে সে মাঝে মাঝে বসে থাকে। শফিকুলের ইচ্ছা, একদিন সে মাইক্রোবাসের চালক হবে।

-কল্লোল মোস্তফা

ফুলটাইম ফার্মার, পার্টটাইম হকার

মো.জাফর মিয়া খুবই নিচু গলায় কথা বলেন। আশপাশের কোলাহল, গাড়ির হর্ন আর রিকশার টুংটাং আওয়াজের মধ্যে তাঁর কথা পুরো বুঝে উঠতে প্রতি মুহূর্তে কানের বেশ ভালো রকমের পরীক্ষাই দিতে হচ্ছিল। চার-পাঁচ বছর ধরে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় ফেরি করে বেড়ালেও ফেরিওয়ালার স্বভাবজাত উঁচু গলার জোর তাঁর একেবারেই নেই। অবশ্য জাফর মিয়াকে পুরোদস্তুর ফেরিওয়ালা বলাও ঠিক হবে না। তিনি পেশায়

কৃষক; আর প্রয়োজনে কখনও ফেরিওয়ালা আবার কখনও ছাতার মিস্ত্রি।

জাফর মিয়ার গ্রামের বাড়ি ফরিদপুরে। স্ত্রী, দুই মেয়ে আর এক ছেলের ছোট পরিবারে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার মতো অবস্থা আছে। এসএসসি পাস বড় মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন প্রায় তিন বছর আগে। ছোট মেয়ে ক্লাস সেভেনে পড়ে আর ছেলেটি সবেমাত্র স্কুলে ভর্তি হয়েছে। জাফর তাঁর ছয় বিঘা জমির দেড় বিঘায় ধান চাষ করেন। বাকি দোফসলি জমিতে করেন পেঁয়াজ, পাট আর গমের চাষ। আবহাওয়া, সেচ ব্যবস্থা আর বাজার ঠিকঠাক থাকলে বছরে তাঁর আয় হয় ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা। জমিতে ধান আছে, গৃহস্থের হাঁস-মুরগি-গরু, ভিটেমাটি–সবই আছে। তবু তিনি কেন ঢাকায়? জানতে চাইলে বলেন, 'জায়গাজমি আছে, ঠিক আছে। সংসারে টানাটানিও নাই। তয় মনে করেন যে প্রতিবছর তো আর এক রহম থাহে না। কোনো বছর দেহা গেল বৃষ্টির লগে শিল পড়ল। তহন কিন্তু বেবাক শ্যাষ। হেই মরসুমে কিন্তু সব কিছু নিজের পকেট থিকা গেল। আয় তো হইলই না, উল্টা গচ্চা দেওন লাগে। আবার মনে করেন যে বাজারের কথাও তো কিছু কওন যায় না। এই ভালো, এই খারাপ।' বোঝা গেল, কৃষক জাফর মিয়া কৃষির অনাকাঙ্ক্ষিত ক্ষতি পুষিয়ে নিতে ঢাকায় এসে মৌসুমি পেশায় নিয়োজিত হন। বর্ষা মৌসুমে দক্ষ হাতে তিনি ছাতা ঠিক করেন আর বাকি সময়ে তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু স্বরে দিনের বেলায় কোরআন-হাদিসের বই ফেরি করেন এবং সন্ধ্যার পর বিক্রি করেন বাহারি রঙের বেলুন।

–ঢাকায় বছরে কত দিন কাজ করেন?

–মনে করেন যে সব মিলাইয়া তিন-সাড়ে তিন মাস।

–থাকেন কই?

–একটা মেসে থাহি। ছয়জন মিইল্যা ৩৬০০ ট্যাকা ভাড়া দেই। নিজেরা বাজার কইরা খাই। দুই বেলায় মনে করেন যে ৮০-৯০ ট্যাকা খরচ। আর দুপুরে খাই হোটেলে।

বর্ষার দিনে জাফর মিয়ার আয় সবচেয়ে ভালো হয়। দিন শেষে ৮০০-৯০০ টাকা পর্যন্ত থাকে। আর অন্য সময়ে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত কোরআন, হাদিস, কিতাব–এসব বই বিক্রি করেন। দুপুরে খেয়ে আবার আসর নামাজের ওয়াক্ত পর্যন্ত তা বিক্রি করেন।

–কেমন বিক্রি করতে পারেন?

–খারাপ না। ভালো বেচাবিক্রি হইলে ৪০০-৫০০ ট্যাকা পর্যন্ত থাহে।

সন্ধ্যার পর জাফর মিয়ার ঝোলা থেকে বের হয় নানা রঙের বেলুন। প্লাস্টিকের চিকন পাইপের মাথায় ছয়টি করে বেলুন দিয়ে একেকটি সেট তৈরি করেন। দাম ১০ টাকা। প্রতি সেট বিক্রিতে লাভ থাকে ৬ টাকা। রাস্তার কোনো এক মোড়ে বা লাইট পোস্টের নিচে দাঁড়ালে তিন-চার ঘণ্টায় ২৫ থেকে ৩০টি সেট অনায়াসে বিক্রি করে ফেলতে পারেন।

চল্লিশোর্ধ জাফরের বাবা-মা মারা গেছেন অনেক আগে। উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর ভাগে পড়া জমির পরিমাণ তিনি কিছুটা বাড়াতে পেরেছেন। কাদা-মাটি-জলের কৃষকপ্রাণে শহুরে কাঠিন্য এখনও জেঁকে বসতে পারেনি। জাফর মিয়ার কথায় মাটির টান স্পষ্ট আর হাসিতে বাধাহীন জীবন।

জাফর মিয়ার সাথে চা খেতে খেতে কথা বেশ জমে উঠেছিল। শেষের দিকে আশপাশের দু-তিনজনও আমাদের কথায় ঢুকে পড়লেন। তাঁদের একজন জাফর মিয়াকে হাস্যচ্ছলে বললেন, 'আপনে তো তাইলে ফুলটাইম ফার্মার আর পার্টটাইম হকার।' মন্তব্যটা যথার্থ হয়েছে বলেই মনে হলো। কৃষিপ্রধান অর্থনীতির এই দেশে পার্টটাইমে কিছু না করলে ফুলটাইম কৃষকের জীবন চালানো ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে পড়ছে।

-মওদুদুর রহমান

গার্মেন্টস শ্রমিক মোমিনের নিজের কথা

আমি ১৯৯৮ সালের শেষের দিকে প্রথম আমার বোনের বাসায় কোনাবাড়ী, গাজীপুরে আসি। সেখান থেকে কাজের সন্ধান করতে থাকি। রাস্তায় এক ব্যক্তির সাথে দেখা হয়। তিনি যমুনা গার্মেন্টের সুপারভাইজার; বিভিন্ন বাসা বা রাস্তা থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করতেন। তাঁর হাত ধরে জীবনে প্রথম গার্মেন্টে ঢুকলাম। হাফ বেলা কাজ করার পর জানলাম, আমার বেতন ধরা হয়েছে ৭৩০ টাকা। আমি হিসাব করে দেখলাম, ৭৩০ টাকায় আমার থাকা ও খাওয়া সম্ভব নয়। তাই পরের দিন যমুনা গার্মেন্টে না গিয়ে খালেক গার্মেন্টে গেলাম; সেখানে আমাকে ফিনিশিং সেকশনে কোয়ালিটি ম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। আমার বেতন ধরা হয় ১০৫০ টাকা। সেখানে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম শ্রমিকদের সাথে কী ধরনের আচরণ করা হয়। কাজে প্রোডাকশন কম হলে কিংবা কোনো একটা কাজ ভুল হলে বাবা-মা তুলে খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করা হয়। আমি আশ্চর্য হতাম–এটা কোন সমাজ, এটা কোন পরিবেশ? এখানে জীবনের কোনো মূল্য নেই। এখানে সম্মান বা মর্যাদা নেই। শুধু চাই প্রোডাকশন।

হতবাক হলাম বাথরুমে যেতে গিয়ে। তাৎক্ষণিক হাতের কাজ সেরে বাথরুমের দিকে গেলাম। বাথরুম ছিল ছাদের ওপর। গিয়ে দেখি, একজন গার্ড বসে আছেন সিঁড়ির মাথায়। আমি যেতে চাইলে তিনি বললেন, পাস আছে? আমি তো হতবাক–পাস! সেটা আবার কী?! তিনি বললেন, তোমার সুপারভাইজারকে বলো, সে তোমাকে বুঝিয়ে দেবে। পরে সুপারভাইজারকে বললাম। তিনি বললেন, একজন ওপরে গেছে, তার কাছে একটা কার্ড আছে, সে এলে সেটা নিয়ে বাথরুমে যাবে। চাকরির এক মাসের মাথায় একদিন আমাদের সামনে সুপারভাইজারকে, জিএম কিংবা পিএম হবেন লাথি মারলেন। কারণ হিসেবে জানতে পারলাম, আমাদের মালের কোয়ালিটি ভালো হয়নি এবং কিছু কিছু কাজ ভুল হয়েছে। সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আর গার্মেন্টে কাজ করব না। বেতন পাওয়ার পর আমি আর গার্মেন্টে গেলাম না। ফিরে গেলাম গ্রামের বাড়ি।

বাড়িতে বেশ কয়েক বছর দোকানে কাজ করলাম। আমার গ্রামের এক চাচা চাকরি করতেন গাজীপুরের বড়বাড়ী লাম্মা সোয়েটারে। ২০০৩ সালের নভেম্বরে তিনি কল করে বললেন, সাউদার্ন সোয়েটারে কাজ শেখানোর জন্য লোক নেওয়া হবে। তুমি চলে এসো, কাজটা শিখতে পারলে ভালো বেতন হবে। সোয়েটারে গালিগালাজ কম, স্বাধীন কাজ। তুমি যেমন কাজ করবে, তেমন বেতন পাবে। আমি শুনে ঐ রাতেই চলে গেলাম। আমরা পাঁচ বন্ধু একসাথে গেলাম। সবার কাজ শেখার সুযোগ হলেও আমাকে নিয়োগ দেওয়া হলো না। তিন মাস বিভিন্ন কাজ করার পর লাম্মা সোয়েটারে কাজ শেখার সুযোগ পেলাম। কাজ শিখে প্রথমে প্যান-প্যাসিফিক, এইচ ফ্যাশন এবং পরে গিভেন্সি গ্রুপের জাহিন-১ সোয়েটারে চাকরি নেই। সেখানে দীর্ঘ সাত বছর চাকরি করি।

ঐ কারখানায় গিয়ে প্রথম দেখলাম, মিন্টু নামের এক শ্রমিককে মারা হলো। কারণটা জানতে পারলাম না। বেশি জানার চেষ্টা করলে চাকরি থাকবে না। ওখানে শ্রম আইন মানা হতো না। মালিক তার ইচ্ছামতো কারখানা পরিচালনা করত। মাসে এক দিন ছুটি ছিল। নিয়োগপত্র ছিল না, আইডি কার্ড ছিল না। নির্দিষ্ট কোনো কর্মঘণ্টা ছিল না। ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা কাজ করানো হতো। কাজ না থাকলে কোনো বেসিক দেওয়া হতো না। কোনো ছুটি দেওয়া হতো না। আমরা যে ডিজাইনের সোয়েটারই তৈরি করতাম না কেন, মজুরি ধরা হতো ১২ টাকা। ১২ টাকার ওপরে দিতই না।

আমরা পিস রেট বৃদ্ধি এবং নির্যাতন বন্ধসহ কয়েকটি দাবিতে কারখানার ভেতরে কাজ বন্ধ রেখে ধর্মঘট শুরু করি। আমাদের প্রথম দাবি ছিল, আমরা আমাদের মালিকের সাথে কথা বলতে চাই। অবশেষে মালিক আমাদের সাথে মোবাইলে কথা বলে জানায়, এক দিন পর তোমাদের সাথে বসব। এক দিন পর মালিক এলাকার মেম্বারকে নিয়ে আমাদের সাথে মিটিংয়ে বসে। সেখানে আমাদের সব অভিযোগ শুনে আমাদের যা দাবি ছিল, তা মেনে নেওয়া হয় এবং বলে, পর্যায়ক্রমে আমাদের সব দাবি বাস্তবায়ন করবে। আমাদের অন্যতম দাবি ছিল, প্রতি সপ্তাহে এক দিন আমাদের সাথে কারখানার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে এবং আন্দোলনরত কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করা যাবে না। মালিক সব মেনে নিয়ে বলল, তোমরা আমার উপস্থিতিতে কাজে যোগ দেবে। আমরা তাঁর উপস্থিতিতে কাজ শুরু করলাম।

কাজ শেষে বাসায় ফিরলাম। রাতে জানতে পারলাম, যারা আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের বাসায় এলাকার মাস্তানরা হামলা করে রাতের মধ্যেই এলাকা ছেড়ে যেতে বলেছে। যারা প্রতিবাদ করেছে, তাদের মেরে আহত করা হয়। হাতের আঙুল ভেঙে দেওয়া হয় এবং যারা পরবর্তীতে কারখানায় কাজ করেছে, তাদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা আরো বেড়ে যায়। এলাকার মাস্তানদের ভয়ে আর কেউ প্রতিবাদ করতে সাহস পাচ্ছিল না। পরবর্তীতে আর কোনো দিন মালিক আমাদের সাথে আলোচনায় বসেনি। আমাদের কোনো দাবিও পূরণ করেনি।

আমার চাকরি চলে যাওয়ার ঘটনা বলি–অনেক স্টাফ জানত, আমি সংগঠন করি এবং প্রতিটি আন্দোলনে আমি অনেক ভূমিকা রাখি। তাই তাদের টার্গেট ছিল আমার ওপর। আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। একবার আমি অনেক অসুস্থ হয়ে পড়লাম। চার-পাঁচ দিন অসুস্থ ছিলাম। অফিসে যেতে পারিনি। পরে যেদিন অফিসে গেলাম, গিয়ে দেখি আমার মেশিনটা আরেক শ্রমিককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। মেশিন নাই মানে চাকরি নাই। তখনও আমি সম্পূর্ণ সুস্থ না। শেষে আমি অ্যাডমিন স্যারের কাছে গেলাম। তাঁকে সব খুলে বললাম। বললাম, আমার শরীরে হাত দিয়ে দেখেন, আমার এখনও জ্বর আছে। এই বলে যখন এগিয়ে গেলাম, তখন তিনি বলে উঠলেন, তুমি দূরে সরে দাঁড়াও, কাছে আসবে না। আমি আশ্চর্য হলাম, আমাদের কত ছোট ভাবা হয়!

আমার কারখানার মালিক বলেছিল, তার ব্যবসার মূল পুঁজি ছিল ২০০ মেশিন। সেখান থেকে এখন আমরা ৪০ হাজার শ্রমিক। এই ২০০ থেকে ৪০ হাজারে পৌঁছানোয় মূল ভূমিকা আমাদের। অথচ আমার শ্রমের টাকায় কেনা এসি, চেয়ার-টেবিলে বসে উনি, আর আমি তাঁর ধারেকাছে যেতে পারব না! অনেক অনুরোধ করলাম–স্যার, আমি ওষুধ কিনব, আমার কাছে কোনো টাকা নাই। আপনি বলে দিলে আমার বেতনটা দিয়ে দেবে। তিনি কোনোভাবেই আমার কথা শুনলেন না এবং মেশিনও দিলেন না। কয়েক দিন বাসায় থেকে মোটামুটি সুস্থ হওয়ার পর ক্রিস্টাল সেলসিয়াস নামে গাজীপুর চৌরাস্তার তেলিপাড়ায় চাকরি নিলাম। ক্রিস্টালের মালিক ছিল বিদেশি। উপরস্থ কর্মকর্তারা ছিল শ্রীলঙ্কান। সেখানে এক বছর চাকরি করার পর ওয়েলফেয়ার কমিটির সিলেকশনে প্রায় ৮০ জন শ্রমিক আমাকে ওয়েলফেয়ার লিডার হিসেবে সিলেকশন করে। আমারও খুব ইচ্ছা ছিল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে জানার।

আমাদের যখন কোনো মিটিং হতো, তখন আমার সুপারভাইজার বলত, তুমি কোনো তর্ক করবে না। মিটিং হতো শ্রীলঙ্কান ঐ কর্মকর্তাদের সাথে। তিনি ইংরেজিতে কথা বলতেন। তা বাংলায় রূপান্তর করার জন্য একজন বাঙালি নারী ছিল। আমরা যা বলতাম, তা ঐ নারী ইংরেজিতে বলত। মিটিংয়ের নিয়ম ছিল, তিনি যা বলবেন তা আমাদের শুনতে হবে এবং কোনো প্রশ্ন করা যাবে না। আমরা যদি কোনো কিছু বলতাম, তা সম্পর্কে তিনি কোনো উত্তর দিতেন না। এভাবে কিছুদিন চলার পর যখন দেখলাম, আমরা শ্রমিকদের কোনো দাবিদাওয়ার কথা বলতে পারি না, যেটুকু বলি তার কোনো জবাব পাই না, তখন আমরা কয়েকজন মিলে ক্যান্টিনে নাশতা খাওয়ার ফাঁকে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমরা যে দায়িত্ব নিয়েছি, তা অবশ্যই জীবন বাজি রেখে হলেও করতে হবে। আলোচনায় দরকষাকষি করতে হবে। আমরা আমাদের যত সমস্যা ছিল, সেগুলোর একটা তালিকা করলাম এবং সিদ্ধান্ত নিলাম, আগামী মিটিংয়ে অবশ্যই আলোচনায় তুলব।

এর ফাঁকে বলে নেই, এই ওয়েলফেয়ার কমিটির কার্যক্রম শুধু মানুষ দেখানো বা বায়ারদের দেখানো। এখানে শ্রমিকদের দরকষাকষির কোনো সুযোগ নেই। মালিকপক্ষ যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার তা আগেই নিয়েছে, পরে মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করে না। যদি কোনো লিডার সেই সিদ্ধান্ত মেনে না নেন, তাহলে তাঁকে ভিন্ন কৌশলে কারখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়।

যাইহোক, পরবর্তী মাসে মিটিংয়ে আমরা উপস্থিত হলাম। সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা আমাদের সমস্ত দাবি উত্থাপন করলাম। সেদিন প্রথম আমরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করে সমস্ত বিষয় নিয়ে তর্কে জড়ালাম। শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের কোনো কথাই মানল না। এই কথা যখন আমরা ফ্লোরে ছড়িয়ে দিতে বললাম যে তারা আমাদের কথা মানে না, তখন সমস্ত শ্রমিকের মনে ক্ষোভ তৈরি হয় এবং কিছুক্ষণ কাজ বন্ধ থাকে। পরে কারখানা ছুটি ঘোষণা করা হয়। পরের দিন সকালে গেটে গিয়ে দেখি, পুলিশ পাহারা রেখে বাছাই করে শ্রমিক ঢোকানো হচ্ছে। রাতে স্টাফরা আন্দোলনকারী শ্রমিকদের একটা তালিকা তৈরি করে। সেই তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের গেটে রেখে অন্যদের ভেতরে ঢোকায়। সেদিন আমাকে গেটে আটকানো হয়নি বা ঐ তালিকায় আমার নামও ছিল না। তার একটা কারণ আছে, সেটা পরে বলছি।

গেটে আমরা অনেকে জানতে চেয়েছিলাম, ওদের আটকানো হচ্ছে কেন? জবাবে বলা হয়েছিল, সবার শেষে তারা ভেতরে ঢুকবে। আমরা তো সকাল ৮:৩০-এ কারখানায় ঢুকি। ৯টার পর আমরা জানতে পারলাম, ওখানে যাদের আটকানো হয়েছে, তাদের একজন করে প্রধান গেটের বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে। আর বাইরে মালিকের ভাড়া করা মাস্তান সেই একজনকে মেরে হাত-পা ভেঙে এলাকা থেকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। এভাবে একজন একজন করে প্রায় ৩৬ জনকে মারা হয়। বিষয়টি কারখানার গেটে ডিউটিরত পুলিশকে জানালে তারা সম্পূর্ণ বিষয়টি নাকচ করে দেয় এবং বলে, এ ধরনের কোনো ঘটনা ঘটেনি এবং আমরা দেখিনি। যাদের বের করে দেওয়া হয় বা যাদের ওপর হামলা করা হয়, তারা অনেকেই ওয়েলফেয়ার কমিটির সদস্য ছিল। এই হলো ওয়েলফেয়ার কমিটির বার্গেনিং করার পরিণতি।

ঐ সময় আমি মারাত্মক একটি জটিল রোগে ভুগছিলাম। এটা কারখানার অধিকাংশ শ্রমিক বা কর্মকর্তারা জানত। আমার ওজন ৫৬ কেজি থেকে ৪৫ কেজিতে চলে এসেছে। যার কারণে আমার সুপারভাইজার ঐ লিস্টে আমার নাম দেয়নি। আমি বিজিএমইএর বিভিন্ন মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। ওরা শুধু জ্বরের ট্যাবলেট, মাথা ব্যথার ট্যাবলেট, সর্দির ট্যাবলেট–এই দিয়ে বিদায় করে দিত। আমাদের অফিসে যে ডাক্তার ছিল, তার সাথে কয়েক দিনে ভালো সম্পর্ক হয়। সে তখন বলে, তুমি আমাদের অপেক্ষায় থাকলে মারা যাবে। এরা আমাদের রাখে লোকদেখানো কারণে। আমাদের রোগ নির্ণয়ের কোনো যন্ত্রপাতি নেই। কোনো ভালো বা দামি ওষুধ নেই। যা আছে, জ্বর-সর্দি আর মাথা ব্যথার। তোমার অসুস্থতার জন্য লম্বা ছুটি দরকার। সেটাও আমি দিতে পারব না। অতএব, তুমি চাকরির আশা

ছেড়ে দিয়ে ভালো ডাক্তার দেখাও। তোমার সম্ভবত ক্যান্সার হয়েছে।

পরে আমাদের কমপ্লায়েন্স অফিসারকে বলি–স্যার, আমি তো খুব অসুস্থ। আমার লম্বা ছুটি দরকার। তখন উনি বলেন, তোমার ছুটি নেওয়া লাগবে না। তুমি চিকিৎসা করে সুস্থ হয়ে আসো। তোমার চাকরি থাকবে। আমার চিকিৎসার জন্য আমার সহকর্মী বন্ধুরা শ্রমিকদের কাছ থেকে টাকা তুলে চিকিৎসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তারা সেই টাকা ওঠানোর জন্য উপরস্থ কর্মকর্তার অনুমতি চেয়েছিল। তারা অনুমতি দেয়নি। বরং তারা বলেছে, এটা কোনো চাঁদা তোলা বা ভিক্ষার জায়গা নয়। যদি আমরা জানি তোমরা এর জন্য টাকা ওঠাচ্ছ, তাহলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। একথা আমি আমার এক সহকর্মীর কাছ থেকে পরে জানতে পারলাম। পরে আমি উত্তরা ক্রিসেন্ট মেডিক্যালে এক ডাক্তারকে দেখালাম। তিনি কয়েকটা পরীক্ষার পর দেখলেন, আমার কিডনির পাশে ছোট ছোট ঘা দেখা যাচ্ছে এবং বাম ফুসফুসে বড় ধরনের ঘায়ের মতো দেখা যাচ্ছে, কিন্তু ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না। এর জন্য সিটিস্ক্যান জাতীয় তিনটি পরীক্ষা দিলেন। এই তিনটি পরীক্ষা করতে ২৫ হাজার টাকা দরকার। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে ১৬ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। আমি এই টাকা নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেও কোথাও ১৬ হাজার টাকায় পরীক্ষা করাতে পারিনি। শেষে ইন্টারন্যাশনাল মেডিক্যাল অ্যান্ড কলেজ, গাজীপুরে ডাক্তারদের যে প্রধান, তাঁর সাথে দেখা করে আমার সব কথা খুলে বললাম। তিনি মেডিক্যালে ভর্তি করিয়ে ১৮টি পরীক্ষা করালেন এবং সিটিস্ক্যান করার জন্য তাঁর বন্ধুর এক মেডিক্যালে পাঠালেন।

সেখানে পরীক্ষার পর দেখা গেল, কিডনির আশপাশে যে ঘায়ের মতো দেখা যাচ্ছে, তা আসলে ঘা নয়, সুতার ময়লার স্পট। ফুসফুসেও একই অবস্থা এবং টিবি রোগ হয়েছে। এই রোগে আবার জ্বর নাই, কাশি নাই, কফও নাই। পরে তিনি বললেন, ৯ মাস ওষুধ খেলে সেরে যাবে। আর গার্মেন্টে চাকরি করা যাবে না, অর্থাৎ ময়লার আশপাশে থাকা যাবে না। ২৬ দিন মেডিক্যালে ছিলাম। তারপর ওই মেডিক্যালের কাগজপত্র ও পরীক্ষার রিপোর্ট নিয়ে ওই কারখানায় গেলাম। আমাকে গেটের ভেতরে ঢুকতে দেওয়া হলো না। পরে কমপ্লায়েন্স অফিসারের কাছে কল করলাম। তিনি আমার সাথে দেখা করে বললেন, তুমি এক মাস অনুপস্থিত, তোমার চাকরি নেই। আমি বললাম, আপনি তো বলেছিলেন চাকরি থাকবে। তিনি বললেন–দেখো, আমার কিছু করার নেই। তোমার চাকরি নেই। তুমি টাইম কিপারের সাথে যোগাযোগ করে পরবর্তী মাসে তোমার কাজের মজুরিটা নিয়ে যেয়ো। এভাবেই চাকরিটা হারালাম।

- শ্রুতিলিখন: শহিদুল ইসলাম সবুজ

'মামা'র দোকানে শিশু শ্রমিক

শেষ বিকেলে ভিড় বাড়ছে ধানমণ্ডি-৩২ এর লেক চত্বরে। বেচাবিক্রিও বাড়ছে লেকঘেঁষা মকবুল মিয়ার দোকানে। চা-সিগারেটের দোকান। দোকানের মহাজন গেছেন নামাজ পড়তে। অসাধারণ দক্ষতায় পুরো বেচাবিক্রি সামলাচ্ছে একা একটি ছেলে, ১২-১৪ বছর বয়স। এরই মধ্যে নামাজ থেকে ফিরে মকবুল মিয়া দোকানের ক্যাশ কাউন্টারের দায়িত্ব বুঝে নিলে চাপ একটু কমে ছেলেটির ওপর। চা বানাতে বানাতেই বলে, 'কী জিগাইবেন, জিগায়ালান এহন।'

–তোমার কাজের চাপ একটু কমুক!

–আর কমব না, এহন ভিড় খালি বাড়তেই থাকব। জিগায়ালান।

–নাম কী তোমার?

–তুহিন মিয়া।

–বয়স কত?

–চৌদ্দ-পনরো অইব।

–দোকান মালিক কী হয় তোমার?

–'মামা' কইয়া ডাহি।

–বেতন কত পাচ্ছ?

–দিনে এক শ। মাজেমইদ্দে বিশ-তিরিশ ট্যাকা বেশি পাই।

–বাসায় আর কে কে আছে? মা-বাবা, ভাই-বোন?

–মায় আছে। ছোড বইন, আমি, আরেকটা বোইন আছে।

–বাবা?

–বাবায় আরেকটা বিয়া করছে। অন্যহানে থাহে। মাজেমইদ্দে আহে, খরচাপাতি দ্যায় না।

–এই দোকানে কত দিন যাবৎ?

–এই...পাঁচ বছর।

–এই চায়ের দোকানের আগে কী করতে?

–এই...আড্ডামাড্ডা মারতাম, ঘুরতাম। যদি ভালা না লাগত, খায়াদায়া গুছল কইরা গুমায়া থাকতাম। আবার সন্দাবেলা বাইরায়া একটা দোকান আছিল ওষুদের, ওনে কিছু কইলে করতাম, আর চকলেট-মকলেট খাইতাম। পানিটানি আইনা দিতাম। আবার ঈদের বেলায় জামা-কাপড় কিনা দ্যায়। হ্যার গাড়ি আছিল, নিজের পোলাগো মতন, মনে করেন, জামা-কাপড় কিনা দিত, ঘুরতে যাইত।

–কাজ করার সময় ব্যথা পাইছ কখনও?

–নাহ্।

–মহাজন বকাটকা দেয়? মারে কখনও?

–নাহ্। তয় কাস্টমারে মারছে।

–কেন?

–খারাপ ব্যবহার করছে। আস্তাজে খারাপ ব্যবহার করলে মনমিজাজ খারাপ অয় না! তহন ফাপর-টাপর দ্যায়, পরে মারে।

–স্কুলে গিয়েছ কখনও?

–বন্দুবান্দব যাইত।

–তোমার যাইতে ইচ্ছা করত না?

–আগে করত না, এহন তো করে। কিন্তুক উপায় কী? ১২টার সুমায় দোকানে আহি, তার আগে তো গুমাই।

–রাতে বাসায় ফেরো কখন? কিভাবে?

–রাইত বারটা-একটা বাজে। মামার সাথেই যাই, রিকশায়। আমাগো বাড়ি একলগেই, রায়েরবাজার। আবার একলগেই আহি।

–তোমার মা কী কাজ করে?

–আগে বাসাবাড়িত কাম করত, এহন শইল খারাপ।

–এই এক শ টাকায় চলে?

–চলে।

–যেদিন দোকান বন্ধ থাকে?

–চলে, টাইনাটুইনা।

–বাসাভাড়া কত?

–দুই হাজার ট্যাকা।

–তাহলে চলে কী করে?

–বাসাভাড়া বইনে দ্যায়। হ্যায় কাম করে। একটা ক্লিনিকে। হ্যায়ও তিন হাজার ট্যাকা পায়।

–তুহিন মিয়া, ভবিষ্যতে কী কাজ করতে চাও?

–জানি না।

বেচাবিক্রির ফাঁকে ফাঁকেই কথা বলছিল তুহিন মিয়া। ভবিষ্যতের কথা জানতে চাইলে হয়তো তার ভাবতে ইচ্ছা করে। কে জানে, হয়তো ভাবেইনি আগে কখনও।

– জুয়েল হাসান